স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সেমেস্টার

‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ পাঠ বিশ্লেষণ

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর কবি কালিদাস। কালিদাস বলতে শুধু ব্যক্তিকেই বোঝায় না, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক সুবর্ণযুগকেও বোঝায়। কিন্তু প্রাচীন কবিদের অনেকের মতোই কালিদাস তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। এই নীরবতাই জন্ম দিয়েছে একাধিক কিংবদন্তীর। কিন্তু এই কিংবদন্তী ও জনশ্রুতিগুলির প্রমাণ্যতা নেই।

সময়কাল

কালিদাসের আনুমানিক সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কোনো সময়।

- খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রচিত দণ্ডীর ‘কাব্যাদর্শ’, বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’, আইহোল শিলালিপি; অষ্টম শতকে রচিত কুমারিল ভট্টের ‘তন্ত্রবার্তিক’-এ কালিদাস বা তাঁর রচনার উল্লেখ আছে। এখান থেকে বোঝা যায় কালিদাস খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী।
- বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। এই বিক্রমাদিত্য ৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিক্রম সংবৎ চালু করেন।
- অন্যান্য মতে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৬-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ) উপাধি বিক্রমাদিত্য। তাঁর সভাকবি কালিদাস।
- বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যাদি ছাড়াও কালিদাসের লেখার বিভিন্ন উপাদান, যেমন— রাজার দেহরক্ষিণী হিসেবে যবনী (গ্রিক), গ্রিক ‘জামিত্র’ শব্দের প্রয়োগ, হূণদের পরাজয়ের উল্লেখ, আদর্শ রাজার বর্ণনায় ‘মনুসংহিতা’-র প্রভাব, শিবভক্তি ইত্যাদি অন্তর্লীন প্রমাণ

অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে কালিদাস ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা চলে।

রচনা

কালিদাস একজন ব্যক্তি না এই ব্যক্তিনামের আড়ালে একাধিক জন আত্মগোপন করে আছেন তা নিয়েও পণ্ডিতমহলে সংশয় রয়েছে। দুটি মহাকাব্য ('কুমারসম্ভবম্', 'রঘুবংশম্'), একটি কাব্য ('মেঘদূতম্'), তিনটি নাটক ('মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্') কালিদাসের রচনারূপে স্বীকৃত। এছাড়াও 'ঋতুসংহার', 'পুষ্পবাণবিলাস', 'শৃঙ্গারাষ্টক', 'নলোদয়' ইত্যাদি রচনাও কালিদাসের নামে চলে আসছে।

গ্রন্থগুলির অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুযায়ী রচনাক্রম মোটামুটি এইরকম—

'কুমারসম্ভবম্'(প্রথম অংশ)> 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'> 'মেঘদূতম্'> কুমারসম্ভবম্'(দ্বিতীয় অংশ)> 'বিক্রমোর্বশীয়ম্',> 'রঘুবংশম্'> 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'

কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বে নাটকের দশটি শ্রেণি স্বীকৃত— নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম ও ঈহামৃগ। 'নাটক' বলতে বোঝায় যার কাহিনি সুপরিচিত, নায়ক হবেন প্রসিদ্ধ ও গুণসম্পন্ন রাজা অথবা রাজর্ষি, অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত, অঙ্কসংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশ, পঞ্চসন্ধি থাকবে, নাম হবে নায়ক অথবা বিষয়বস্তুর অনুসরণে। সেদিক থেকে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' আদর্শ নাটক। পুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত ও আশ্রমকন্যা শকুন্তলার প্রণয়কাহিনি এই নাটকের উপজীব্য। কাহিনি কালিদাসের উদ্ভাবিত নয়, ঐতিহ্যবাহী কাহিনির নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন কালিদাস। শকুন্তলা হয়ে উঠেছেন নাটককারের মানসলোক-জাতা। নাটকে মানুষ ও অনির্বচনীয় সম্পর্ক প্রতিভাসিত হয়েছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় মানবিক আবেগের সংরাগে গ্রথিত। ভাষা ছন্দ অলঙ্কারের উৎকর্ষে অসামান্য। এছাড়া সংস্কৃত ভাষার নাটক হলেও প্রাকৃত ভাষা ও প্রাকৃত গানের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য।

নাটকের চরিত্রসমূহ

পুরুষ-চরিত্র

সূত্রধার, দুষ্যন্ত, সূত (দুষ্যন্তের সারথি), বৈখানস (কণ্বের শিষ্য), মাধব্য (বিদূষক), সেনাপতি, রৈবতক (দ্বারপাল), করভক (বার্তাবহ), হারীত (কণ্বের শিষ্য), কণ্ব (ঋষি), নারদ (দেবর্ষি), গৌতম(ঋষি), শার্ঙ্গরব (কণ্বের শিষ্য), শারদ্বত (কণ্বের শিষ্য), ঋষিগণ, শিষ্য, বাতায়ন (রাজকর্মচারী), বৈতালিকদ্বয়, সোমরাত (দুষ্যন্তের পুরোহিত), শ্যাল (কোতোয়াল), জানুক ও সূচক (নগররক্ষী), ধীবর, মাতলি (ইন্দ্রের সারথি), সর্বদমন/ ভরত (দুষ্যন্তের পুত্র), মারীচ (ঋষি), গালব (মারীচের শিষ্য)।

নারী-চরিত্র

নটী, শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, গৌতমী, তাপসীগণ (৩ জন), বেত্রবতী (দ্বারপালিকা), সানুমতী (মেনকার সখী), পরভৃতিকা-মধুকরিকা-চতুরিকা (দুষ্যন্তের পরিচারিকা), সুব্রতা (মারীচাশ্রমের তাপসী), তাপসী, অদিতি (মারীচের পত্নী), যবনী (দুষ্যন্তের পরিচারিকা)।

কেবলমাত্র উল্লিখিত পাত্র-পাত্রী

ইন্দ্র, জয়ন্ত (ইন্দ্রের পুত্র), কৌশিক/বিশ্বামিত্র, মেনকা, দুর্বাসা, মিত্রাবসু, রাজমাতা, হংসপদিকা, বসুমতী, তরলিকা, পিশুন, ধনমিত্র, কালনেমি ও তার বংশধরগণ, মার্কণ্ডেয়, বৃদ্ধ শাকল্য, রাক্ষসগণ।

নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

প্রথম অঙ্ক

অষ্টমূর্তিধর শিবের বন্দনা দিয়ে নাটকের সূচনা। নটী এবং সূত্রধারের মুখে নাটকের পরিচয় প্রদান। ধনুর্বাণ হাতে হরিণের অনুসরণ করতে করতে দুষ্যন্তের মঞ্চে প্রবেশ। একজন আশ্রমের তাপস দুষ্যন্তকে আশ্রমমৃগ বধ না করতে অনুরোধ করলে রাজা বিরত হলেন। তখন তাপস তাঁকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ করে কণ্বমুনির আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণের অনুরোধ জানালেন। তাপস আরও জানালেন মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থে গেছেন এবং তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলাই অতিথিসেবার দায়িত্বে। মালিনী নদীর তীরে আশ্রমে প্রবেশ করে দুষ্যন্ত দেখলেন তিনজন অপরূপা সুন্দরী আশ্রমকন্যা (শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা) গাছে জল দিচ্ছেন। গাছের আড়াল থেকে দুষ্যন্ত তাদের দেখলেন এবং একসময় প্রকটিত হলেন। প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পারস্পরিক অনুরাগ সখীদের নজর এড়াল না। এমনসময় রাজার সঙ্গে আসা মৃগয়ার সঙ্গী ও হাতির উপদ্রবে তপোবনে আলোড়ন সৃষ্টি হলে রাজা তার প্রতিকার করলেন এবং তপোবনের অদূরেই শিবির স্থাপন করলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজাকে সঙ্গদান করতে করতে বিদূষক মাধব্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তিনি যত শীঘ্র সম্ভব রাজধানীর আয়েশি জীবন ফিরে পেতে চান। কিন্তু রাজা শকুন্তলার আকর্ষণে আশ্রম ছেড়ে যেতে চাইছেন না এটা মাধব্য বুঝতে পারলেন। মাধব্যের সঙ্গে দুষ্যন্তের এই বিষয়ে কথা হল। এমন সময় আশ্রমের দুজন তাপস এসে রাজাকে আশ্রমে রাক্ষসদের উপদ্রবের প্রতিকার করতে অনুরোধ জানালেন। এমন সময় রাজধানী থেকে একজন বার্তাবহ এসে জানালেন রাজমাতা ‘পুত্রপিণ্ডপালন’ উপবাস উপলক্ষ্যে রাজাকে কাছে পেতে চান। রাজা নিজের প্রতিনিধি হিসেবে বিদুষককে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং অনুরোধ করলেন শকুন্তলার কথা প্রকাশ না করতে।

তৃতীয় অঙ্ক

রাজা রাক্ষসদের বিতাড়িত করলেন। শকুন্তলার অন্বেষণে বেরিয়ে মালিনীতীরে বেতসকুঞ্জে সখীসহ শকুন্তলাকে আবিষ্কার করলেন। শকুন্তলা তখন সখীদের কাছে তাঁর দুষ্যন্তের প্রতি মনোভাব ব্যক্ত করছিলেন এবং পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে প্রেমপত্র রচনা করে সখীদের পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। রাজা অন্তরাল থেকে সমস্ত শুনে আত্মপ্রকাশ করলেন। সখীরা তাঁদের ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বর্ষীয়সী তাপসী গৌতমী শকুন্তলাকে নিয়ে গেলেন এবং দুষ্যন্ত আত্মগোপন করলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

গান্ধর্বমতে গান্ধর্বমতে পরিণীতা শকুন্তলাকে রাজা রাজধানীতে ফিরে মনে রাখবেন কিনা এ বিষয়ে আলোচনা করছেন এমনসময় ক্রোধী মুনি দুর্বাসা তপোবনে এলেন। পতির চিন্তায় আন্‌মনা শকুন্তলা দুর্বাসার উপস্থিতি গ্রাহ্যই করলেন না। ক্রুদ্ধ দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন। দুই সখীর প্রচেষ্টায় দুর্বাসার ক্রোধ শান্ত হল এবং তিনি বললেন দুষ্যন্তের বিস্মৃতি অপনোদনের উপায় কোনো অভিজ্ঞানের প্রদর্শন।

মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলেন এবং জানা গেল তিনি ইতোমধ্যেই দৈববাণীর দ্বারা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহের কথা জেনেছেন এবং সানন্দে এই বিবাহ অনুমোদন করেছেন।

শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর আয়োজন শুরু হয়। আসন্ন বিদায়ের চিন্তায় আশ্রমবাসী থেকে তরুলতা পশুপাখি পর্যন্ত আকুল। দুই সখী শকুন্তলাকে সাজিয়ে দিলেন। গোটা আশ্রমকে শোকাকুল করে সজলনয়নে শকুন্তলা আশ্রমতাপস শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমীর সঙ্গে রাজধানীর দিকে রওনা হলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুরে রাজার পূর্ব প্রণয়িনী স্ত্রী হংসপদিকা সংগীতের মাধ্যমে রাজার প্রতি তাঁকে ভুলে যাওয়ার জন্য অভিমান ব্যক্ত করছিলেন। আপাতগ্রাহ্য কোনো কারণ না থাকলেও সংগীত শ্রবণের পর রাজা উৎকণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন।

এমন সময় শকুন্তলার রাজসভায় আগমনের সংবাদ এল। আগত আশ্রমবাসীরা তাঁদের আগমনের কারণ বললেন কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপের প্রভাবে শকুন্তলাকে বিবাহের কথা দুষ্যন্তের স্মরণে এল না। দুষ্যন্তকে অভিজ্ঞান (চিহ্ন) অঙ্গুরীয় দেখাতে গিয়ে শকুন্তলা দেখলেন তা তাঁর হাতে নেই। প্রণয়ের অনেক খুঁটিনাটি কথা শকুন্তলা দুষ্যন্তকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো লাভ হল না, বরং তাঁর চারিত্রিক সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। আশ্রমকুমাররা জানালেন তাঁদের কর্তব্য শেষ, স্ত্রীকে গ্রহণ- বর্জন রাজার ব্যাপার। এই বলে তাঁরা ফিরে গেলেন। রাজপুরোহিতের বিবেচনা অনুসারে স্থির হয় সন্তানপ্রসব পর্যন্ত শকুন্তলা রাজপুরোহিতের গৃহে থাকতে পারবেন।

এমন সময় শকুন্তলার মাতা অপ্সরা মেনকা শকুন্তলাকে আকাশপথে নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। পুরোহিতের মুখে রাজা এই বৃত্তান্ত শুনে রাজা চিন্তিত হলেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক

একজন ধীবর রুই মাছের পেটে রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পেয়ে বাজারে বিক্রি করতে এসে চোর সন্দেহে রক্ষীদের হাতে ধৃত হয়। বিচারের জন্য তাকে রাজসমীপে আনা হলে অঙ্গুরীয় দেখে রাজার পূর্ববৃত্তান্ত মনে পড়ে যায়। তিনি উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়ে ধীবরকে বিদায় করেন ও নিজের কৃতকর্মের জন্য ব্যথত হন।

ক্রমশ অনুতাপ আরও বাড়তে থাকে। তাঁর অনুতাপ দর্শন করে শকুন্তলার মাতা মেনকার সখী সানুমতী মেনকাকে সব জানাবেন স্থির করেন।

এমন সময় নিঃসন্তান বণিক ধনমিত্রের মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তি নিয়মানুসারে রাজার অধিকারভুক্ত হওয়ার উপক্রম হলে দুষ্যন্ত নিজেকে নিঃসন্তান অনুভব করে আরও ব্যথিত হলেন।

ওদিকে ইন্দ্রের সারথি মাতলি রাজার কাছে এলেন স্বর্গে দানববিনাশে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। রাজা তাঁর সঙ্গে রওনা হলেন।

সপ্তম অঙ্ক

স্বর্গে দানববিজয় সম্পন্ন করে ফেরার পথে দুষ্যন্ত হেমকূট পর্বতে অবস্থিত মারীচের আশ্রমে এলেন ঋষিকে দর্শনের অভিলাষে। সেখানে সিংহশিশুর ওপর উৎপীড়নরত এক বালককে দেখে রাজার মনে অপত্যস্নেহের উদ্রেক হল। তাপসীদের মুখে রাজা শুনলেন এই বালকের পুরুবংশে জন্ম এবং তার পিতা অকারণে তার মাকে পরিত্যাগ করেছেন। এবং তাপসীদের মুখে 'শকুন্তলাবণ্য প্রেক্ষস্ব' শুনে রাজা বিচলিত হলেন।

এমন সময় মলিনবেশে শকুন্তলা সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা শকুন্তলার কাছে ক্ষমা চাইলেন। শকুন্তলা কেবল নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিলেন। রাজা সস্ত্রীক সপুত্র মারীচ ও অদিতিকে প্রণাম করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের উৎস-বিচার

আগেই বলা হয়েছে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক শ্রেণিভুক্ত অর্থাৎ এর কাহিনি নাটককারের মৌলিক উদ্ভাবন নয়, এই কাহিনি ঐতিহ্যে আগে থেকেই ছিল। রামায়ণ, কট্ঠহরি জাতক, পদ্মপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এই কাহিনির সূত্র রয়েছে বলে মনে করা হয়।

- রামায়ণ ও কট্ঠহরি জাতকে অনুরূপ বৃত্তান্ত না থাকলেও ঘটনাবিন্যাসের মিল দুর্লক্ষ্য নয়।

- পদ্মপুরাণের সঙ্গে এই নাটকের কাহিনির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও এই পুরাণে কাহিনিটি প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তাই এই গ্রন্থকে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের উৎস বলা সমীচীন নয়।
- কালিদাস এই নাটকের কাহিনি মহাভারত থেকে সংগ্রহ করেছেন বলেই মনে হয়।

উক্ত গ্রন্থগুলির কাহিনির সঙ্গে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এর কাহিনির সাদৃশ্য ও অভিনবত্বের দিকগুলি সংক্ষেপে এই রকম—

রামায়ণ

রামায়ণের বিষয়বস্তু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বলে অবেক গবেষক মনে করেছেন। রামায়ণের রামসীতার জীবনে বিচ্ছেদ, এবং এই নাটকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার জীবনেও বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এসেছে। রামায়ণে গর্ভবতী সীতাকে প্রজানুরঞ্জনের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হয়, এখানেও অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে বিনা দোষে রাজা প্রত্যাখ্যান করেন। দুই ক্ষেত্রেই পুত্রদের জন্ম আশ্রমে এবং তারা বড় হলে পিতার সঙ্গে মিলন হয়। দুই সাহিত্যকৃতির বিষয়বিন্যাসেও রয়েছে সাদৃশ্য। রামায়ণে সাত কাণ্ড, 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ সাত অঙ্ক। রামায়ণের বালকাণ্ডে রামের সীতাপ্রাপ্তি, এখানে প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্তের তপোবনে প্রবেশ এবং শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়। দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ডে নগরবাসে রামের নিস্পৃহভাব, দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্যন্তের সেই অবস্থা। অরণ্যকাণ্ডে রামের অরণ্য ও মুনিঋষির আশ্রমাদিতে বাস, তৃতীয় অঙ্কে দুষ্যন্তেরও আশ্রমে অবস্থান। চতুর্থ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতাবিয়োগ, চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাবিয়োগ। পঞ্চম সুন্দরকাণ্ডে রামের অঙ্গুরীয়সহ হনুমানের প্রস্থান, পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার অঙ্গুরীয়সহ গমন। যুদ্ধকাণ্ডের অন্তিমে সীতাপ্রাপ্তি, ষষ্ঠ অঙ্কে শকুন্তলাকে পরিণয়ের স্মৃতি। উত্তরকাণ্ডে পুত্র-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সপ্তম অঙ্কে মারীচাশ্রমে সর্বদমন ও শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন। (সূত্র-)

তবে আমাদের মনে হয় ঘটনার বিন্যাসে কিছু চমকপ্রদ সাদৃশ্য থাকলেও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের উৎস হিসেবে সরাসরি রামায়ণকে নির্দেশ করা সংগত নয়, বরং বলা যেতে পারে রামায়ণের কাহিনির প্রভাব এখানে রয়েছে।

কট্ঠহরি জাতক

এই জাতকের কাহিনি অনুসারে বারাণসী্রাজ ব্রহ্মদত্ত উদ্যানবিহারে গিয়ে এক সুন্দরী নারীকে দেখে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং নিজের নামখোদিত এক আংটি তাকে দিলেন। বোধিসত্ত্ব পুত্ররূপে সেই রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। পরে সপুত্র সেই রমণী ব্রহ্মদত্তের সভায় গিয়ে তাঁদের গ্রহণ করতে বললেন। অঙ্গুরীয় দেখানো সত্ত্বেও লোকলজ্জার ভয়ে রাজা তাঁদের অস্বীকার করলেন। রমণী তখন ধর্ম সাক্ষী করে বললেন বালক যদি রাজার সন্তান হয় তবে তাকে আকাশে ছুঁড়ে দিলেও সে আকাশে ভেসে থাকবে এবং না হলে সে ভূপতিত হবে। রমণীর অঙ্গীকার সত্য হল। রাজা তখন পুত্রকে গ্রহণ করলেন এবং রমণীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন।

মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলোপাখ্যানের সঙ্গে এই জাতকের বৃত্তান্তের সাদৃশ্য বর্তমান।

পদ্মপুরাণ

পদ্মপুরাণের কাহিনি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের কাহিনির প্রায় অনুরূপ, শুধু কয়েকটি জায়গায় সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন সেখানে শকুন্তলার সঙ্গে প্রিয়ংবদাও রাজসভায় গেছে। তাছাড়া প্রিয়ংবদাকে শকুন্তলা স্নানের আগে আংটিটি খুলে রাখতে দিয়েছিলেন, প্রিয়ংবদার অসাবধানতায় সেটি জলে পড়ে যায়। প্রিয়ংবদা ভয়ে ঘটনাটি প্রকাশ করেন নি এবং শকুন্তলা উদাসীন ছিলেন। পদ্মপুরাণে আছে দুষ্যন্ত সর্বদমনকে দেখে যখন অপত্যস্নেহ অনুভব করছিলেন তখন ভগবান মারীচ সেখানে উপস্থিত হয়ে দুষ্যন্তকে দুর্বাসার অভিশাপবৃত্তান্ত ও সর্বদমনের পরিচয় দেন। আর নাটকে আছে দুষ্যন্ত আগে পুত্র ও পত্নীর সঙ্গে মিলিত হন

কালিদাস তাঁর নাটকের কাহিনি পদ্মপুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করলেও এই ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়। পদ্মপুরাণ বর্তমানে যে অবস্থায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, শকুন্তলার কাহিনি কালিদাস-পরবর্তী সম্ভাবনাই বেশি। পদ্মপুরাণের কয়েকটি সংস্করণে শকুন্তলার বৃত্তান্ত অনুপস্থিত।

মহাভারত

মহাভারতের কাহিনিতে দুর্বাসার অভিশাপ-বৃত্তান্ত ও প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার বেদনার কাহিনি নেই। সেখানে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে গিয়ে দুষ্যন্ত তার পরিচয় পেলেন এবং বিবাহ করতে চাইলেন। শকুন্তলা মহর্ষির প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সামান্য অপেক্ষা করতে বললেন কিন্তু রাজা অবিলম্বেই শকুন্তলাকে পেতে চাইলেন। শকুন্তলা তখন ভবিষ্যতে তাঁদের পুত্রই হবে রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে গান্ধর্ববিবাহে সম্মতি দিলেন। দুষ্যন্ত অবিলম্বেই চতুরঙ্গ বাহিনী পাঠিয়ে শকুন্তলাকে আশ্রমে নিয়ে যাবেন এই আশ্বাস দিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরে এই বিয়ে অনুমোদন করলেন। কণ্বের আশ্রমেই সর্বদমনের জন্ম। ছয় বছর বয়সেই সর্বদমন অমিত শক্তির অধিকারী। বহু রাক্ষস তার হাতে প্রাণ হারিয়েছে। তার এইসব অতিমানুষিক কাজ দেখে কণ্ব তার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হয়েছে ভেবে এবং এতদিনেও দুষ্যন্ত এতদিনেও শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠালেন না দেখে চিন্তিত হয়ে কণ্ব কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে শকুন্তলাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা দুষ্যন্তের অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ থাকলেও পাছে লোক কিছু মনে করে সেই আশঙ্কায় তিনি এই বিবাহ অস্বীকার করলেন এবং শকুন্তলাকে কুলটা দুশ্চরিত্র পাপিয়সী বলে নির্দেশ করলেন। শকুন্তলাও কর্কশ বাক্যে রাজাকে যোগ্য জবাব দিলেন এবং তাঁর মতো মিথ্যাচারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চান না বলে চলে যেতে উদ্যত হলেন। অখন আকাশ থেকে দৈববাণী হল যে সর্বদমন দুষ্যন্তেরই পুত্র এবং শকুন্তলার যেন অবমাননা না করা হয়। রাজা তখন সব স্বীকার করলেন এবং স্ত্রী-পুত্রকে গ্রহণ করে সুখী হলেন।

লক্ষণীয়, অঙ্গুরীয় প্রদান বৃত্তান্ত এবং দুর্বাসার অভিশাপের আখ্যান মহাভারতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। জেলের মাধ্যমে আংটি ফিরে পেয়ে রাজার সব মনে পড়ার কাহিনিও স্বাভাবিকভাবেই মহাভারতে নেই। এটিই মূল পার্থক্যের জায়গা। এছাড়াও সেখানে চরিত্রগুলি অনেক আদিম, মিলন-বিরহ কাতরতা তাদের মধ্যে অপ্রাপ্ত। তপোবনচারিণী শকুন্তলার চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে কালিদাস মানুষ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতির এক অনির্বচনীয় রূপ ও সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। বলা যেতে পারে, মহাভারতের আদিপর্বের শকুন্তলা

উপাখ্যান এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। কিন্তু মহাভারতের যা এক সাধারণ গল্প, তা কালিদাসের কবিত্বপ্রতিভায় পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে, নীরস খড়ের কাঠামোয় এক অপরূপ শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের প্রতিফলিত সমাজচিত্র

আমরা সকলেই জানি নাটককে জীবনের দর্পণ বলা হয় কারণ প্রায় সব নাটকেই সমকালীন মানবজীবন, রীতিনীতি ও সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সব দেশের সব কালের নাটক সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। প্রচলিত প্রসিদ্ধ বৃত্তান্তকে (রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি) অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও নাটককাররা অনেক অভিনব বিষয় সংযোজন করে দর্শক বা পাঠকের কাছে তাকে উপস্থাপিত করেন বলে পরোক্ষভাবে হলেও তাতে সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' গোত্রবিচারে একটি নাটক অর্থাৎ এর কাহিনি সুপরিচিত, নাটককারের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্গত একটি উপাখ্যানেরর নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন কালিদাস। এখানে প্রচলিত কাহিনিকে নিজস্ব ভাবনার আধারে বিন্যস্ত করেছেন কালিদাস, সংযোজিত হয়েছে অনেক নতুন চরিত্র, খুঁটিনাটি ঘটনা ও নাট্যপরিস্থিতি। কালিদাসের সময়কার এবং নাট্যবিষয়ের সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'-এ সমাজব্যবস্থার যে দিকটি প্রথমেই নজরে পড়ে তা হল বর্ণাশ্রম প্রথা। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হত। পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাজা দুষ্যন্তের কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করার সময় বিভিন্ন মন্তব্য এবং মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে অনুপস্থিত জেনে তাঁর প্রণতি-জ্ঞাপন থেকে এই বিষয়টি স্পষ্টই বোঝা যায়। সপ্তম অঙ্কেও রাজা কালক্ষেপ না করে ঋষিদের আদেশ পালন করেছেন, রাক্ষস বিতাড়ন করেছেন এবং নিষ্কর তপস্বীদের আদেশকেই অক্ষয় সম্পদ জ্ঞান করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে রাজসভায় শকুন্তলার লাঞ্ছনার সময় শার্ঙ্গরবের সঙ্গে দুষ্যন্তের ক্ষুব্ধ

বাদানুবাদ ঋষিদের অখণ্ড প্রতাপের প্রমাণ। সামান্যতম কর্তব্যচ্যুতিতেই ঋষিদের ক্রোধ প্রকাশিত হত। এ প্রসঙ্গে দুর্বাসার অভিশাপের অংশ স্মরণীয়।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— প্রত্যেকের জন্যই নির্দিষ্ট কর্তব্যপালনের সামাজিক উপায় ছিল। তার মাধ্যমেই সমাজব্যবস্থা গতিশীল ছিল। পশুবলি চালু ছিল, যজ্ঞীয় পশু ব্রাহ্মণরাই বধ করতেন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম প্রথা বহমান ছিল।

সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্তের 'মহর্ষি কণ্বের অব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হতে পারে' উক্তি থেকে এই সম্ভাবনা অনুমান করা যেতে পারে। গান্ধর্ব বিবাহের প্রচলন ছিল। সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল বিশেষত রাজা এবং ধনীদের মধ্যে।

সমাজের পুরুষদের পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। শকুন্তলার দুষ্যন্তের কাছে প্রণয়পত্র রচনা করে পাঠানো এবং সখীদের সঙ্গে কথোপকথনে তার পরিচয় মেলে। প্রথাসিদ্ধ লেখাপড়ার বাইরেও মুনি-ঋষিদের কাছে বিভিন্ন ধর্মমূলক আখ্যান প্রভৃতি শুনে তাঁরা শিক্ষালাভ করতেন। শকুন্তলার অপূর্ব শ্লোকরচনা প্রমাণ করে তাঁর শিক্ষা নেহাত সাধারণ স্তরের ছিল না। সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও চিত্রাঙ্কন প্রভৃত কলাবিদ্যাতেও নারী-পুরুষ উভয়েরই জ্ঞান ছিল। ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্যন্তের অসাধারণ চিত্র অঙ্কনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময় বনদেবতার দেওয়া অলঙ্কারে সখীরা সাজাতে গিয়ে বলেছিলেন— 'আমরা আভরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলেও ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা থেকেই তোমাকে সাজাচ্ছি'। সূত্রধর পত্নী এবং হংসপদিকার সংগীত তাদের উচ্চমার্গের সংগীত চর্চার পরিচায়ক। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এবং শকুন্তলার সঙ্গে রাজার কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের পরিশীলিত আচারবোধের পরিচয় মেলে। তবে স্ত্রী-স্বাধীনতা খুব বেশি ছিল না বলেই মনে হয়। স্বামী কর্কশ ব্যবহার করলেও তা সহ্য করা (চতুর্থ অঙ্ক), বিবাহিতা নারী বেশিদিন পিতৃগৃহে থাকলে তার নিন্দা হয় (পঞ্চম অঙ্ক), পতিকুলে দাসীত্বও শ্রেয় (পঞ্চম অঙ্ক), পত্নীর উপর স্বামীর সর্বোতমুখী প্রভুত্ব (পঞ্চম অঙ্ক) ইত্যাদি বক্তব্য তার প্রমাণ।

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বোচ্চ স্থান রাজার। তিনি নিজেই বিচারকার্য দেখেছেন। বিশেষ প্রয়োজনে অমাত্যর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত। নগররক্ষায়

সচেতন রক্ষীদের কথা আছে ষষ্ঠ অঙ্কে। অনেক সময় রাজশ্যালক রক্ষীদের প্রধান হতেন। নিষ্ঠুরতা, সন্দেহভাজনকে উৎপীড়ন করা, উৎকোচ গ্রহণে আগ্রহ ইত্যাদি রক্ষীদের বিশেষত্ব ছিল। চুরি করার অপরাধে কঠোর দণ্ড দেওয়া হত। রাজার আংটি চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বধদণ্ড কার্যকর করার বিচিত্র উপয়ের কথাও এখানে জানা যাচ্ছে। রাজার অপরাধে বা কুশাসন দেখা দিলে প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুসারে গাছ তার ফুল উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। ষষ্ঠ অঙ্কে বণিক ধনমিত্রের কাহিনি থেকে আমরা উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে জানতে পারি। সেক্ষেত্রে উল্লেখনীয়, গর্ভস্থ সুন্তানও পিতৃসম্পদের অধিকারী হত।

করব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রজারা তাঁদের উৎপাদিত শস্য বা দ্রব্যের ছয় ভাগের একভাগ কর হিসেবে রাজাকে দিতেন। অরণ্যবাসী মুনি-ঋষিদের তপস্যায় সঞ্চিত পুণ্যবলের এক ষষ্ঠাংশ কর হিসেবে প্রাপ্য জেনে রাজারা কৃতার্থ বোধ করতেন (দ্রষ্টব্য- দ্বিতীয় অঙ্ক)।

অন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও বহির্ভারতে বাণিজ্য হত। চীনদেশীয় বস্ত্রের কথা প্রথম অঙ্কে রয়েছে। ষষ্ঠ অঙ্কে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। ব্যবসায়ীরা প্রভূত ধনের অধিকারী ছিলেন।

আশ্রমে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁরা বল্কল ব্যবহার করলেও সাধারণ মানুষ বস্ত্রই ব্যবহার করতেন। ধনী ও রাজপুরুষদের মধ্যে ক্ষৌমবস্ত্র, চীনাংশুক প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। অলঙ্কারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই রুচি ছিল। ধাতব অলঙ্কারের সঙ্গে পুষ্পাভরণের প্রচলন ছিল। যানবাহনের ক্ষেত্রে রাজপুরুষ এবং ধনীদের জন্য রথাদির ব্যবহার ছিল। সপ্তম অঙ্কে আকাশমার্গে ভ্রমণের কথা আছে।

ভারতীয় সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ আর তার চিত্রকর কালিদাস। অরণ্যের পরিবেশে যা ছিল প্রণয় রাজসভায় তা হয়ে দাঁড়াল বিস্মৃতি। রাজা ভুলে গেছেন শকুন্তলাকে, শকুন্তলা হারিয়ে ফেলেছেন অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়। কীভাবে শকুন্তলা প্রমাণ করবেন তিনি দুষ্যন্তের পত্নী আর দুষ্যন্তই বা কীভাবে শকুন্তলাকে নিজের পত্নী হিসেবে গ্রহণ করবেন— এ এক জটিল সংঘাতময় মুহূর্ত। এইভাবেই দৃশ্যকাব্যের ঘনঘটায়, শীতলতায় ও সংঘাতে, আবেগে ও আখ্যানে গড়ে উঠেছে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা। ঋষি, রাজা, তপোবনবাসী নরনারী, সাধারণ নগরবাসী, ধীবর,

বণিক, পুরোহিত, দৌবারিক— সব মিলিয়ে ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’-এ পাওয়া যায় বৃহত্তর মানসমাজের এক বিচিত্র ছবি।

এই বিষয়টি উপস্থাপনে যে-সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১। সত্যনারায়ন চক্রবর্তী সম্পাদিত, ‘মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতম্ ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৯

২। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস’, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২

৩। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ‘প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার’, কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরি, ২০০৪

৪। করুণাসিন্ধু দাস, ‘সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা’, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫

৫। দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, ‘নাট্যতত্ত্ব বিচার’, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৫